সৃষ্টির তাৎপর্য

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ১-৩১ পদ

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে যে সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাকে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনুন্নত প্রাথমিক চিন্তা হিসাবে অনেকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সচেতন মানুষের কাছে আদিপুস্তকের সৃষ্টিতত্ত্ব আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছু না। এমনকী অনেক তথাকথিত খ্রীস্টবিশ্বাসীও বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও, আদিপুস্তক এবং বিশেষ করে এর প্রথম ১১ অধ্যায়ের প্রতি অবিশ্বাসের কথা গর্বের সঙ্গে জোর গলায় প্রকাশ করে থাকেন। তারা আদিপুস্তককে এইভাবে তুচ্ছজ্ঞান করলেও নতুন নিয়মের সত্যতা বা শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু মজার বিষয় হল, যে নতুন নিয়মের শ্রেষ্ঠত্ব তারা স্বীকার করে থাকেন, সেই নতুন নিয়ম ২০০ বারেরও বেশি আদিপুস্তককে উদ্ধৃত করেছে এবং ১০০ বারেরও বেশি আদিপুস্তকের প্রথম ১১ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। এর দ্বারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় কেবল বিশ্বাসযোগ্য অধ্যায় নয়, সমগ্র বাইবেলের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু জগতের মানুষ এর সত্যতাকে অস্বীকার করে, কারণ শুরুতেই আদিপুস্তক একাধিক মিথ্যা শিক্ষা বা মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। ***"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন,"*** এই বিবৃতির দ্বারা বাইবেল সরাসরি জগতের বিভিন্ন মতবাদকে খণ্ডন করেছেঃ (১) নাস্তিকতা *(Atheism)* - যে মতবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না;(২) সর্বেশ্বরবাদ *(Pantheism)* - যে মতবাদ সমস্ত বিষয়কে ঈশ্বর বলে;(৩) বহু-ঈশ্বরবাদ *(Polytheism)* - যে মতবাদ অনেক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে;(৪) দ্বৈতবাদ *(Dualism)* - যে মতবাদ ঈশ্বরের পাশাপাশি বিশ্বভূমণ্ডলেরও ক্ষমতায় বিশ্বাস করে;(৫) বিবর্তনবাদ *(Evolutionism)* - যে মতবাদ প্রকৃতির ক্ষমতায় বিশ্বাস করে।

এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে, একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বিবর্তনবাদকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ, এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা আমাদের এমন মিথ্যা কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে, যে বিবর্তনবাদ হল বিজ্ঞান-প্রমাণিত সত্য। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীকে ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ১৮০০-এর মাঝামাঝি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করতে শুরু করে। এই সময় চার্লস্ ডারউইনের লেখা **"প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি"** *(Origin of Species by means of Natural Selection)* নামক পুস্তক প্রকাশনের পর সমগ্র ইউরোপের বুকে যে ঝড় ওঠে, তার ফলস্বরূপ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞান-পুস্তকে স্থান দেওয়া শুরু হয়।

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে যদিও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ (১) সৃষ্টিবাদ (ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি) এবং (২) বিবর্তনবাদ। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আপনি এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনও একটিকে পছন্দ করতে পারেন। কিন্তু প্রথম থেকে একটি সত্য মনে রাখবেন, আপনার পছন্দের মতবাদ বিশ্বাসমাত্র— কেউই এর কোনোটি প্রমাণ করতে পারে না, কারণ জীবনের শুরুতে আমরা কেউই উপস্থিত ছিলাম না। তাই, আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে, বা আমরা যে সমস্ত ইঙ্গিত বা সঙ্কেত সংগ্রহ করতে পারি, তার উপর নির্ভর করে আমরা পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস গড়তে পারি।

প্রথমে আমরা বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি। চার্লস্ ডারউইন প্রকৃতপক্ষে জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেননি;প্রাথমিকভাবে তিনি কেবল জীবনের অগ্রগতি সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে (প্রাকৃতিক নির্বাচন) আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। একে সহজ কথায় বলা যায় যে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে জীবন ক্রমশ সরল থেকে জটিল হয়েছে। ডারউইনের লেখা পরবর্তী চিঠিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি "মহা-বিস্ফোরণ" তত্ত্বের *(Big Bang)* পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এই তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেয় যে,

শুরুতে কোনও কারণে প্রথম থেকে বিদ্যমান এক প্রকার সুপের আকারে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছিল, যা বিদ্যুতের ন্যায় একপ্রকার শক্তির দ্বারা তড়িতায়িত *(charged)* হয়, ফলস্বরূপ অ্যামাইনো অ্যাসিড *(Amino Acid)* আমিষে *(Protein)* রূপান্তরিত হয় এবং *RNA* অনুতে পরিণত হয়, যা নিজে নিজে অবিকল প্রতিরূপ সৃষ্টি করে *DNA*-কে জন্ম দেয়, যার অন্য নাম জীবন। কিন্তু এই সুপের আকারে অ্যামাইনো অ্যাসিড বা বিদ্যুতের ন্যায় শক্তি কোথা থেকে এল, সে সম্বন্ধে এই তত্ত্ব কোনও উত্তর দেয় না। হ্যাঁ, তা আমার আপনার মতো কেউই জানে না, ডারউইনও জানতেন না। কারণ, তখন আমরা কেউ ছিলাম না এবং সেই সময়ের কোনও তথ্য সরাসরি আমাদের কাছে নেই। বাধ্য হয়ে ডারউইন তার **"প্রজাতির উৎপত্তি"** *(Origin of Specis)* এবং **"মানুষের উদ্ভব"** *(Descent of Man)* পুস্তক দুটিতে ৮০০ বারেরও বেশি এমন কথা বলেছেন, *"আমরা ধরে নিতে পারি . . ."* বা *"যদি একথা সত্য হয়, তাহলে . . .।"*

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন। এই মতবাদ মূলত আকস্মিকভাবে *(by chance)* জীবনের উৎপত্তি এবং একই পদ্ধতিতে সরল থেকে জটিলতর অনুতে পরিবর্তনের দ্বারা সমস্ত জীবের সৃষ্টির কথা বলে থাকে। এখন একই প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তনের ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে ২০০-রও বেশি প্রজাতির কুকুরের অস্তিত্ব আমাদের চোখে পড়লেও, অ্যামিবা কীভাবে মাছ হল বা সাপ হল বা স্তন্যপায়ী হল, তা প্রমাণ করতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। তাই, অভিব্যক্তিবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন হল একটি বিশ্বাসমাত্র— মানুষ তার স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস করে যে, *"যদিও আমি জানি না যে কোথা থেকে প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিড বা শক্তি বা পদার্থ এল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ সকল সৃষ্টি করা হয়নি, এ সকল আকস্মিকভাবে প্রথম থেকে ছিল এবং এর থেকে জীবনের প্রবাহ শুরু হয়েছে।"*

একদিকে, এমন তথাকথিত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করা এবং অন্যদিকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, যিনি শূন্য থেকে সমস্ত সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা— কোনটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য? মানুষ হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবগত আছি— এক প্রজন্মের মানুষ যখন বিভিন্ন তত্ত্বকে প্রমাণিত সত্য বলে জাহির করেছে, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ তাকে ভুল বলেছে। তাই, ইতিহাসের সত্য অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কখনও মানুষের মনগড়া বিবর্তনবাদকে সৃষ্টিবাদের উপরে স্থান দিতে পারি না। বস্তুত, সৃষ্টিবাদ কখনও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নয়। কারণ, ঈশ্বর যদি পৃথিবী এবং তার মধ্যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন, বিজ্ঞান অবশ্যই ঈশ্বরকে নির্দেশ করতে বাধ্য। তাই, সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে সৃষ্টিবাদের পক্ষে তাদের মত প্রকাশ করে চলেছেন।

এখন এই দুইয়ের মধ্যে আপনি কোনটিতে বিশ্বাস করেন, তার প্রভাব আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে পড়তে বাধ্য। আপনি যদি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন, আপনার কাছে জীবনের অর্থ কী? বিবর্তনবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে কয়েকটি বিষয় আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। (১) ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আমাদের অস্তিত্ব আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। (২) মৃত্যুর পরবর্তী কিছু নেই। যেহেতু আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হিসাবে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, সেইহেতু মৃত্যুও আমাদের কাছে আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। তাই, মৃত্যুর পর কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। (৩) ভালো বা মন্দের কোনও চরম ভিত্তি নেই। আমরা আমাদের নৈতিক কাজের জন্য কারও কাছে দায়িত্বশীল নই। আমরা যা আমাদের জন্য ভালো বলে মনে করব, তা-ই করব। তার জন্য আমি কারও কাছে কৈফিয়ত দেব না। (৪) জীবনের কোনও অর্থ নেই। জন্ম, কয়েক বছরের জীবন, তারপর মৃত্যু। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। যদি আমার জন্ম আকস্মিক দুর্ঘটনা হয় এবং কেবল কয়েক বছরের জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়ে থাকি; তাহলে, জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই বা সমাজে অন্যদের জন্যও চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল নিজের সুখ-শান্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট।

কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যে বিশ্বাস করেন,

তাহলে আপনার জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যে বিশ্বাস করার অর্থ হল— পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব কোনও আকস্মিক দূর্ঘটনা নয়, কিন্তু সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও কার্যের ফল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা হঠাৎ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ নয়, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের সদৃশ হই এবং তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা উপভোগ করি। আমরা **"যোগ্যতমের উদ্বর্তনের"** *(Survival of the fittest)* ফলস্বরূপ বেঁচে নেই, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ভালোবাসার ফলস্বরূপ বেঁচে আছি। এমন সুন্দর পৃথিবীর নকশা দেখে, একে যিনি রূপদান করেছেন, সেই ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই। সৃষ্টিতে বিশ্বাস করার অর্থ এর সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাস। আমরা সেই প্রেমময় ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনের নিকাশ দিতে বাধ্য, যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন এই জীবনের জন্য সৎ উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী জীবনের জন্য সিদ্ধতা। এই ঈশ্বর কেবল এই পৃথিবী ও আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবদ্ধ হতে তিনি আমাদের আহ্বান জানান। এর ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য খুঁজে পাই।

আদিপুস্তকের সৃষ্টির বিবরণে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা এমন ঈশ্বরের সন্ধান পাই, যাঁতে আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা বর্তমান। (১) আমাদের ঈশ্বর অনন্ত, তিনি কোথা থেকে আসেননি, তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। ***"সদাপ্রভু চিরকাল সমাসীন থাকবেন; তিনি বিচারার্থে নিজের সিংহাসন স্থাপন করেছেন"*** (গীত ৯.৭)। (২) আমাদের ঈশ্বর শক্তিমান। অন্য দেবতা বা অসুরদের ধবংস করার পর তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেননি; তিনি এত শক্তির অধিকারী যে শূন্য থেকে কেবল তাঁর কথার দ্বারা সমস্তই সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন শূন্য থেকে এমন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে, তিনি তাঁর ক্ষমতায় আমাদের জীবনে এমন কাজ করতে পারেন, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। (৩) আমাদের ঈশ্বর আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণকারী। ঈশ্বর আমাদের (মানুষ) সৃষ্টি করার পূর্বে ৩য় দিনে মাটিতে সব ধরনের ঘাস, ওষধি, সবজি ও ফলের গাছ সৃষ্টি করেছেন (১১-১৩ পদ); ৪র্থ দিনে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করেছেন (১৪-১৯ পদ); আবার ৫ম ও ৬ষ্ঠদিনে জলে মাছ, আকাশে পাখি ও মাটিতে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করেছেন (২০-২৫ পদ)। এর থেকে পরিষ্কার যে ***"আমাদের সৃষ্টি করার আগে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তিনি সমস্ত আয়োজন করেছেন"*** (২৯ পদ; প্রেরিত ১৪.১৭)। (৪) আমাদের ঈশ্বর দয়ালু ঈশ্বর। ঈশ্বর যদিও জগৎ সৃষ্টি করতে বাধ্য ছিলেন না, কিন্তু তিনি এমন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন (২৮-৩০ পদ), কারণ আমাদের ------এই সুন্দর সৃষ্টি করেছেন (১তীমথিয় ৬.১৭)।

এর দ্বারা আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, যেহেতু ঈশ্বর এ সমস্তের সৃষ্টিকর্তা, ***"তাঁর সাক্ষাতে কোনও সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁর চক্ষুগোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত যাঁর কাছে আমাদের নিকাশ দিতে হবে"*** (ইব্রীয় ৪.১৩)। আজ আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার সামনে কীভাবে উপস্থিত হয়েছেন? তাঁকে এই সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে, না মনগড়া কাল্পনিক কাহিনীর নায়ক হিসাবে কল্পনা করে? আপনি কি আপনার নিজের ক্ষমতায় তাঁর সামনে নিজেকে যোগ্য হিসাবে আপনার জীবনের নিকাশ দিতে উপস্থিত করবেন? না-কি, আপনাকে সৃষ্টির পিছনে তাঁর ভালোবাসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্বীকার করে, তাঁর ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যীশু খ্রীস্টকে আপনার ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও প্রভু বলে স্বীকার করে, তাঁর তৈরি পথে তাঁর কাছে নিজেকে উপস্থিত করবেন? আমাদের প্রত্যেককে একদিন তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। একবারও কি আপনি ভেবে দেখেছেন, তাঁর সামনে আপনি কীভাবে উপস্থিত হবেন? যীশু খ্রীস্টের ধার্মিকতা পরিধান করে, না আপনার পাপ ও স্বার্থপরতার আত্মগরিমা পরিধান করে?